ব্যক্তি জ্যোতি বসু, তাঁর বিবেক

তসলিমা নাসরিন

খুব বড় মানুষদের সঙ্গে আমি যেচে কোনওদিন পরিচিত হতে বা খাতির জমাতে যাই না। এ আমার স্বভাবের বাইরে। বড়রা যদি আমার ব্যাপারে অত্যন্ত আগ্রহ দেখান, তাহলেই সশরীরে উপস্থিত থেকে বড়দের আগ্রহ যথাসম্ভব মেটাতে অথবা দূর করতে তেমন আপত্তি করি না। বড়দের কাছে আমার না যাওয়ার কারণ কিন্তু অহংকার নয়, নিতান্তই সংকোচ। বড়রা ব্যস্ত মানুষ, অযথা তাদের বিরক্ত না করে দূর থেকে তাঁদের সরবে নীরবে শ্রদ্ধা করে যাওয়াই স্বাস্থ্যসম্মত। কিন্তু আমারই তৈরি এই নিয়ম অনিচ্ছেসত্ত্বেও কখনও কখনও আমাকে ভাঙতে হয়েছে। ফ্রাঁসোয়া মিতেরোঁর সঙ্গে দেখা করতে হবে, জ্যাক শিরাখের সঙ্গেও। লিওনেল জসপাঁ তোমাকে ডেকেছেন, সিমোন ভেইল অপেক্ষা করছেন। গুন্টার গ্রাসএর সঙ্গে দেখা করবে এসো, অ্যালেন গিন্সবার্গ কথা বলবেন। বাধ্য হয়েছি দেখা করতে। বড়দের সঙ্গে সত্যি বলতে কী কখনও কোনও সম্পর্ক গড়ে ওঠে না আমার। ওঁদের সঙ্গে দেখা হয়, ওঁরা চমৎকার কথা বলেন, কেউ কেউ বেশ আদর যত্নও করেন। কিন্তু বিদেয়টা শেষ বিদেয়ই হয়। যোগাযোগে আলসেমি আছে বলে ও পথ মাড়াই না, আর বড়রা বড় বলে খুব স্বাভাবিক যে কোনও খোঁজ খবরও আর করেন না।

জ্যোতি বসুর সঙ্গে বছর দশ আগে এভাবেই আমার দেখা হয়েছে। কারও কাছে কোনও আবদার করিনি, কোনও ইচ্ছে প্রকাশ করিনি, হঠাৎ শুনি তাঁর সঙ্গে আমার দেখা করার দিন তারিখ সব ঠিক। ঘটনাটি ঘটিয়েছেন আমার এক শুভাকাঙক্ষী, সম্ভবত তিনি আমাকে বড় জাতের কিছু বলে ধারণা করেছিলেন। জ্যোতি বসুর মতো বিশাল এক মানুষের সঙ্গে আমার মতো ক্ষুদ্র লেখক, রাজনীতির মাথামুণ্ডু যে কিচ্ছু জানে না, কী কথা বলবে! নিজের মূর্খতা আর অজ্ঞতা নিয়ে আশংকায় কুঁকড়ে ছিলাম। আমি ক্ষুদ্র জেনেও আমার সঙ্গে দেখা করতে কোনও অনীহা ছিলো না জ্যোতি বসুর। তিনি তো এলেনই, তাঁর স্ত্রীও এলেন, এমনভাবে কথা বলছিলেন যেন আমাকে কতকাল চেনেন, যেন আমি তাঁদের আত্মীয় কোনও। মানুষ খুব বড় হলে সম্ভবত অচেনা অজানা লোক আর নিজের মাঝখানে কোনও দেয়াল রাখেন না। এই প্রথম আমি কোনও বড় মানুষের কাছাকাছি এসে বোধ করলাম যে মানুষটির সঙ্গে আবার কখনও আমার দেখা হতে পারে। তাঁর সঙ্গে রাজনীতির সাদা কালো, মন্দ ভালোর গল্প করার আমার কোনও দরকার নেই। আমি শুধু তাঁর শৈশব কৈশোরের গল্প, তাঁর দুঃখ সুখের, আনন্দ বেদনার ছোট ছোট কথা কাহিনী শুনেই মুগ্ধ।

যখন পশ্চিমবঙ্গ সরকার আমার বই নিষিদ্ধ করেছিলো, সিদ্ধান্তটি যদিও অগণতান্ত্রিক এবং বাক স্বাধীনতা বিরোধী, দলের সিদ্ধান্ত বলেই আশংকা করেছিলাম জ্যোতি বসুও বই নিষিদ্ধের পক্ষে। কিন্তু আমাকে বিস্মিত করে দলের একজনই, একমাত্র তিনিই, বই নিষিদ্ধ করার বিপক্ষে নিজের মত প্রকাশ করলেন। তিনি মনে করেন না বই নিষিদ্ধ করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কোনও ভালো কাজ করেছে।

কখনও কারও পায়ের ধুলো নিইনা আমি। জ্যোতি বসুরও নিইনি। যখনই দেখা হয়েছে, শ্রদ্ধাভরে নমস্কার করেছি। কৃতজ্ঞতা প্রকাশে চিরকালই আমি খুব আনাড়ি। জানি না তিনি বুঝতে পেরেছেন কিনা তাঁর দলের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে হলেও মত প্রকাশের অধিকারের পক্ষে কথা বলে শুধু নিজেকেই তিনি মহান করেননি, আমরা যারা লড়াই করছি এই অধিকারের পক্ষে, আমাদের প্রচুর শক্তি আর সাহস জুগিয়েছেন। জ্যোতি বসু সম্পর্কে মন্দ কথা বলার লোকের অভাব নেই। উন্নাসিক ছিলেন? হয়তো ছিলেন। বই নিষিদ্ধের বিপক্ষে তাঁর বক্তব্য শুনে তাঁকে উন্নসিক তো নয়ই, বরং বড় বিচক্ষণ, বড় বুদ্ধিদীপ্ত মানুষ বলে আমার মনে হয়েছে। অন্য কোনও কমিউনিস্ট নেতা, দলের সিদ্ধান্ত, সে সিদ্ধান্ত ভুল হলেও, আদর্শগত কারণে তা মানতে না পারলেও মুখ ফুটে কিছু বলেননি। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কী হতে পারে কোনও দলে নাম লেখাতে হলে যদি নিজস্ব বোধ-বুদ্ধি-বিবেক বিসর্জন দিয়ে তবে লেখাতে হয়! যদিও কমিউনিজমে ধর্ম মানা নেই, তারপরও ধর্মের সমালোচনা করেছি এই দোষে আমাকে দোষী করে কমিউনিস্টরা আমার বই নিষিদ্ধ করে মত প্রকাশের স্বাধীনতার চিতার ওপর ধর্মীয় মৌলবাদীদের বিজয় পতাকা উড়িয়ে দিলেন। এই বিজয় মৌলবাদীদের এত উৎসাহ দিয়েছে যে প্রকাশ্যে তারা একের পর এক আমার মাথার দাম ঘোষণা করতে কোনও দ্বিধা করেনি, রাস্তায় আগুন জ্বালানোর সাহসও তাদের হয়েছে।

হায়দারাবাদে মৌলবাদী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর কলকাতায় ফিরে টের পেলাম আমাকে আমার নিজের বাড়িতেই বন্দি করা হয়েছে। ঘর থেকে কোথাও বেরোবার অধিকার আমার নেই। পুলিশের লোক যারা আমাকে নিরাপত্তা দিতেন, তারাই আমার পায়ে অদৃশ্য শেকল পরিয়ে দিলেন। শুধু তাই নয়, মূখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে পুলিশের বড় কর্তারা আমাকে ভয় দেখাতে আসতেন, ভালোয় ভালোয় দেশ ছেড়ে বা রাজ্য ছেড়ে যেন কোথাও চলে যাই। আমি যাইনি কোথাও, গৃহবন্দি অবস্থাতেই মাসের পর মাস কাটাতে থাকি। বাজারে যাবো। হবে না। বন্ধুদের বাড়ি? না। ডাক্তারের কাছে? না। জ্যোতি বসুর বাড়ি? পুলিশের মধ্যে হৈ চৈ পড়ে গেল। আমার গৃহবন্দিত্ব দু ঘন্টার জন্য ঘোচানো হলো। যে সময় পশ্চিমবঙ্গের কোনও কমিউনিস্ট নেতাই আমার সঙ্গে দেখা করেন না, আমি একটা ভয়ংকর নিষিদ্ধ নাম, আমাকে সমর্থন করা মানে, তাদের বদ্ধ বিশ্বাস, ভেড়ার পালের ভোট হারানো , সে সময় জ্যোতি বসু আমার

সঙ্গে দেখা করেছেন। কারও বিরুদ্ধে আমি কোনও অভিযোগ করতে যাইনি তাঁর কাছে। দুজন আমরা গল্প করছিলাম সেই আগের দিনের মতো। তিনি তাঁর দেশের বাড়ি, তাঁর পাড়া পড়শি, তাঁর শৈশব কৈশোরের কথা বলছিলেন। বলছিলেন দেশভাগ, ধর্মান্ধতা, মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার কথা। আমার লেখালেখি আর এর ঐতিহাসিক গুরুত্বের কথা। একসময় বললেন, ' কেউ কাউকে মেরে ফেলতে চাইলে কেউ আটকাতে পারে না।' তা ঠিক, যে হারে মানববোমার চাষ হচ্ছে, সংশয় জাগেই। তবে ব্যক্তির নিরাপত্তার চেয়ে গোটা সমাজ এবং গোটা বিশ্বের নিরাপত্তা নিয়ে আমি উদ্বেগ প্রকাশ করি। আমাকে গৃহবন্দি করার সরকারি সিদ্ধান্তের নিন্দা করেছিলেন জ্যোতি বসু। তিনি কোনও যুক্তি খুঁজে পাননি রাজনৈতিক বালখিল্যতার। তাঁর পক্ষে যদি সম্ভব হতো আমাকে গৃহবন্দিত্ব থেকে মুক্তি দেওয়া, দিতেন।

দিন যে কত পাল্টে গেছে আক্ষেপ করছিলেন। এমনকী পত্রপত্রিকা নিয়েও। বললেন, "আজকাল কোনও একটা কাগজ পড়া যায় না, কী সব মেয়েদের ছবি দিয়ে পাতাগুলো ভরে রাখে।" তা ঠিক, আমি সম্পূর্ণই একমত তাঁর সঙ্গে। আধুনিকতার নামে মেয়েদের ন্যাংটো করার যে প্রবণতা চারদিকে শুরু হয়েছে, তা যে আসলে আধুনিকতা নয়, মেয়েদের নিতান্তই যৌনবস্তু ভাবার মানসিকতারই দুর্গন্ধ, তা, জ্যোতি বসু, পুরোনো কালের মানুষ হলেও, আমার বিশ্বাস, চিন্তায় চেতনায় একজন আধুনিক মানুষ ছিলেন বলেই বুঝতেন!

দোষ করেছে মৌলবাদীরা, তাও আবার হায়দারাবাদে, তার শাস্তি আমাকে পশ্চিমবঙ্গে বসে পেতে হচ্ছে! দুহাজার সাত সালের আগস্ট থেকে নভেম্বর। কী ভয়ংকর যে সেই শাস্তি। যে বাঙালি লেখককে অন্যায়ভাবে তার দেশ থেকে তাড়ানো হয়েছে, পূবে যার ঠাঁই নেই, পশ্চিমই ছিল যার শেষ ভরসা, সেই নিরীহ নির্বাসিত লেখকের বাংলায় বাস করার স্বপ্নকে দুমড়ে মুচড়ে পিষে মেরে ফেলার ফতোয়া জারি হলো। বাংলা থেকে আমাকে উৎখাত করার এই সরকারি ফতোয়া মৌলবাদীদের জারি করা ফতোয়ার চেয়েও বেশি ভয়ংকর। এরপর আগুন জ্বললো কলকাতায়। কিছু জঙ্গিকে খুশি করার জন্য সত্যের জন্য, সমানাধিকারের জন্য সংগ্রাম করা লেখককে রাজ্যছাড়া করা হলো। আমাকে রাজ্য থেকে তাড়ানোর সরকারি সিদ্ধান্তও জ্যোতি বসু মেনে নেননি। মাঝে মাঝে ভাবি, আমাকে সমর্থন জানানোর কী প্রয়োজন তাঁর ছিলো! না রাজনৈতিক, না অরাজনৈতিক কোনও সাফল্যই ওতে আসবে না, উনি তো জানতেনই সেটা। অবাক হয়ে লক্ষ করেছি, যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছি, তিনি অসুস্থ, তিনি ব্যস্ত, তবু দেখা করেছেন। যখনই ফোনে কথা বলতে চেয়েছি, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন, কথা বলেছেন। কী প্রয়োজন ছিলো তাঁর স্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়ার! অনেক ক্ষুদ্রতা, অদূরদর্শিতা, কুপমণ্ডুকতা, অনেক স্বার্থপরতার উর্ধ্বে ছিলেন বলেই তিনি যেতে পেরেছিলেন। তাঁর হয়তো অনেক শত্রু ছিলো, রাজনীতিতে ভুল ত্রুটি তিনি হয়তো কম করেননি। সেসব বিশ্লেষণ করতে

আমি বসিনি। একজন বিজ্ঞ অভিজ্ঞ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের ভেতরে যে সমমর্মী, সহৃদয়, সংবেদনশীল মানুষকে দেখেছি, সেটুকুই আজ শুধু সবিনয়ে স্মরণ করছি।

দিল্লিতেও অজ্ঞাতস্থানে আমাকে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছিলো। শ্বাসরোধ করা সেই বন্দিত্ব থেকে প্রাণপণে মুক্তি চাইছিলাম, ফিরতে চাইছিলাম আমার সাজানো গোছানো সংসারে, আমার কলকাতার বাড়িতে। কোনও কমিউনিস্ট নেতাই তখন আমার কলকাতা ফেরা সমর্থন করেননি। শুধু সবাইকে অবাক করে জ্যোতি বসু বলেছিলেন 'ওয়েলকাম টু কলকাতা'। আমার নিরাপত্তার দায়িত্ব কেন্দ্রের কাঁধে দিয়ে সুক্ষ্ম একটু রাজনীতি তিনি করেছিলেন বটে, তবে উনি ছাড়া আর কেউ আমাকে 'স্বাগতম' জানাননি। বাংলার একমাত্র এবং শেষ আশ্রয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে আমার নিষ্ঠুর নির্মম গলাধাককার বিরুদ্ধে সরকারি বা বিরোধী দলের রাজনৈতিক নেতারা যখন কেউ কিছু উচ্চারণ করছেন না, দিল্লির কোনও এক 'নিরাপদ বাড়ি'র অনিশ্চিত অন্ধকারে, নিশ্ছিদ্র নিঃসঙ্গতায় যখন তলিয়ে যাচ্ছি, জ্যোতি বসুর ওই স্বাগতম শব্দটি শুনে চোখে জল এসেছিলো আমার।

জ্যোতি বসু অসুস্থ, যে কোনও সময় তিনি মারা যাবেন, এসব শুনলে বুকের ভেতরটা কেমন ঠাণ্ডা হয়ে যায়, যেন একজন অভিভাবক ছিলেন বাড়িতে, হঠাৎ সবার ওপর অভিমান করে তিনি চলে যাচ্ছেন। অনেক বছর তিনি বেঁচেছেন, তারপরও মনে হয় আরও বেঁচে থাকুন। তাঁকে দেখার জন্য ব্যাকুল ছিলাম আমি, ছুটে যেতে চেয়েছি কলকাতায়। কিন্তু সরকার থেকে বলে দেওয়া হয়েছে , হবে না। কয়েক বছর আগে আমার বাবা যখন শয্যাশায়ী, বাবাকে শেষ দেখা দেখার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আকুল আবেদন জানিয়েছিলাম। সরকার কঠিন কণ্ঠে বলে দিয়েছে, হবে না।
জ্যোতি বসুর সঙ্গে আমার দেখা হয়নি। আমার বাবার সঙ্গেও হয়নি। পূর্ব বাংলার রাজনীতি আমাকে আমার বাবার কাছে বসে তাঁর হাত দুটি ধরে পরম শ্রদ্ধায় তাঁর আদর্শের সামনে মাথা নোয়াতে দেয়নি। পশ্চিম বাংলার রাজনীতি একজন মহান মানুষের কাছে গিয়ে তাঁর চলে যাওয়ার আগে তাঁকে শেষ নমস্কার করার সুযোগ আমাকে দেয়নি।

মানুষ মরে যায়। মানুষ নিয়ে মানুষের কুৎসিত রাজনীতিই শুধু মরে না।